গৃহ-ভারতীতে শরৎচন্দ্র

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে গৃহ-ভারতীর কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

ভাগলপুর শহরের মাইল ষোলো দক্ষিণে একটি গ্রাম আছে—নাম রামচন্দ্রপুর। স্থানীয় লোকদের ভাষায় 'রামচনপুর'। ভাগলপুর থেকে সেখানে যাবার দুটি পথ আছে। একটি পথে ষোলো মাইল হেঁটে বা গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়। মাইল তিন-চার ছাড়া সমস্তটাই কাঁচা রাস্তা, এক হাঁটু ধুলো। মধ্যে একটা স্বচ্ছ জলের ছোট নদীও পড়ে। বর্ষার ছাড়া অন্য সময়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। অন্য পথটি ভাগলপুর থেকে বেশী যাবার পাকা সড়ক 'বাস' চলে। মাইল দশেক বাস-এ গিয়ে জগদীশপুর নামতে হয়—সেখান থেকে উত্তর-মুখে মেঠো রাস্তা ধরে মাইল ছয়েক হাঁটতে হয় বা গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়। এই দিক দিয়ে রামচন্দ্রপুরে যাবার আর একটি উপায়ও আছে। ভাগলপুর স্টেশন থেকে মন্দার হিল-এর ট্রেনে চড়ে টিকানি স্টেশনে নেমে মাইল ছয়েক মেঠো রাস্তায় উত্তর মুখে হেঁটে বা গোরুর গাড়ীতে গেলে রামচন্দ্রপুরে পৌঁছনো যায়।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভাই অঘোরনাথ ১৯০৬-৭ সালে রামচন্দ্রপুরের কাছে শ'খানেক বিঘে ধান জমি কেনেন। অঘোরনাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথ (শরৎচন্দ্রের মণিমামা) এই জমি দেখাশোনা করতেন। সে সময়ে তিনি নিজে ত মাঝে মাঝে সেখানে যেতেনই—কখনো কখনো শীতকালে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী সুদ্ধ সকলকে সেখানে নিয়ে যেতেন এবং সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ভাগলপুরের বাড়ীতে ফিরে আসতেন। উদার অনন্ত নীল আকাশের নীচে দিগন্তপ্রসারী বিশাল উন্মুক্ত মাঠ। দূরে দূরে কিছু কিছু গাছপালা দেখা যায়। এখানে ওখানে দু-একটা অশত্থ কিংবা বটগাছ চোখে পড়ে। গ্রামবাসীদের বাড়ীগুলি মাটির, ছাউনি খড়ের। আশেপাশে কাছে দূরে আরো গ্রাম অছে, বাড়ীগুলি দেখা যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি শীর্ণ নদী বয়ে চলেছে ঝির ঝির করে; বর্ষার গেরুয়া রঙের জলের ঢল নামে সেই নদীতে। জায়গাটির এক এক ঋতুতে এক এক রকম রূপ।

মণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মেজভাই সুরেন্দ্রনাথের ওপর এই ধান জমি দেখাশোনার ভার পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীপন্থী। তাঁর দুঃসাহসিকতাও ছিল একটু বেশী। ভাগলপুরের স্বনামখ্যাত আইন ব্যবসায়ী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের জন্যে তাঁর বাবা ও মা'র নামে পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—ছেলেদের জন্যে দুর্গাচরণ এম ই স্কুল আর মেয়েদেব জন্যে মোক্ষদা গার্লস স্কুল। দুর্গাচরণ এম ই স্কুলকে বাংলা স্কুল বলা হত। শরৎচন্দ্র এক সময়ে এই স্কুলে পড়েছিলেন। যখনকার কথা বলছি তখন সুরেন্দ্রনাথ এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পরে তিনি তাঁর স্কুলে চরকা কাটার ক্লাশ খোলেন, তাঁত বসান, এবং দেশলাই তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গানের দুটি পঙ্‌ক্তি মনে আসছে : মধুগুঞ্জন মনোরঞ্জন কমলার প্রিয় সাথী/চরকা তোমারে যেই রাখে ঘরে, দুয়ারে বাঁধে সে হাতী। ইংরেজ শাসকদের তখন রক্তচক্ষু ও উগ্রমূর্তি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ করেননি। গান্ধীজী সে সময়ে একাধিকবার ভাগলপুরে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।* (১)

কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ রামচন্দ্রপুরে গিয়ে বসবাস ও চাষবাস করার সংকল্প করেন এবং সেখানে গ্রাম থেকে একটু তফাতে, কাঁচা ইটের একটা বাসযোগ্য বাড়ী তৈরী করিয়ে একদিন ভোরে ভাগলপুরের বাড়ী থেকে সপরিবারে গোরুর গাড়ীতে করে রামচন্দ্রপুরে চলে যান।

সুরেন্দ্রনাথের অনেক পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে একটি হল—'গৃহ-ভারতী' নামে রামচন্দ্রপুরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এ কাজে তখন তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন স্বার্থলেশহীনা এক ভদ্রমহিলা, নাম মনোরমা রায়। তিনি মোক্ষদা গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস ছিলেন। সে-কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি গৃহ-ভারতীতে যোগ দেন।

গৃহ-ভারতীর আর একটা পরোক্ষ পরিচয়ও আছে। বিপ্লবীদের আত্মগোপনের আদর্শ স্থান ছিল গৃহ-ভারতী। তখনকার বাংলার বেশ কিছু বিপ্লবী গৃহ-ভারতীতে গিয়ে দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকতেন। মনে আছে, শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্যকে আমি একবার গৃহ-ভারতীতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সম্ভবত কোনো বিপ্লবীর সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে গিয়েছিলেন।* কোনো কোনো সাহিত্যিকও সেখানে গিয়ে থেকে এসেছেন। 'কালি-কলমে'র সম্পাদক মুরলীধর বসু তাঁদের মধ্যে একজন।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের (রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বেদানন্দ) মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। স্থান পরিবর্তনে তাঁর শোক কিছু প্রশমিত হতে পারে এই ভেবে সুরেন্দ্রনাথ সামতাবেড়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গৃহ-ভারতীতে নিয়ে আসেন।

আমি তখন ভাগলপুরে আমাদের বাঙ্গালীটোলার বাড়ীতে (শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী) থাকি। সুরেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে আমি তাঁদের আসবার দিন সকালে ভাগলপুর স্টেশনে গেলাম। হাওড়ার গাড়ী এল। একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা থেকে শরৎচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ নামলেন। শরৎচন্দ্রের হাতে একটা ছোট গড়গড়া, তাতে বেত দিয়ে বোনা একটা ছোট সটকা লাগানো। দেখলাম, শরৎচন্দ্রের সফরের সঙ্গী তাঁর ভোলা চাকর তাঁর সঙ্গে আসেনি।

আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে প্রথম যে কথা সেদিন আমাকে বলেছিলেন তা আমার আজো পরিষ্কার মনে আছে।

তিনি বললেন—ছোড়দার ছেলে 'পপি'কে গুলি করে মারলে, আর তোরা কিছু বললি না?

তাঁদের ছোড়দা ছিলেন শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ ওরফে রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোড়দা শরৎচন্দ্র মজুমদার এবং আমাদের প্রতিবেশী। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এলে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং দু-জনে গল্প গুজবও বহুক্ষণ হত।

পপি ছিল আমাদের বাড়ীর কুকুর—সাধারণ দেশী কুকুর, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। ভাগলপুরে এলে শরৎচন্দ্র পপিকে খুবই আদর-যত্ন করতেন; তাকে সাবান মাখিয়ে স্নান করাতেন, দু-বেলা নিজের খাওয়ার পর তাকে নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতেন। পপিও তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেত না, দিন-রাত তাঁর কাছে কাছেই থাকত। পপিকে কেউ বকলে বা মারলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পপির অযত্ন-অনাদরও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। এই নিয়ে তাঁর কাছে আমরা অনেক বকুনি খেয়েছি। তাঁর সেই আদরের পপির মৃত্যু হয়েছে বন্দুকের গুলিতে, এ খবর শুনে অবধি তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। খুব সম্ভবত ট্রেনে আসতে আসতেই তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে এই দুঃসংবাদ শোনেন—কেননা তখনো পর্যন্ত তাঁর খুবই উত্তেজিত অবস্থা।

তাঁর অভিযোগের উত্তরে আমি বললাম—আমরা কি বলব বলুন?

তিনি বললেন—আমি সেখানে থাকলে আমার রিভলবার নিয়ে গিয়ে তাকেই গুলি করে মারতাম।

তিনি প্ল্যাটফর্মে অশান্তভাবে পায়চারি করতে করতে তামাক খেতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পায়চারি করার পর তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দু চোখে জল। বললেন—কি করেছিল পপি?

—ওদের কম্পাউণ্ডে ঢুকেছিল।

—ব্যস্? এই অপরাধে তাকে গুলি করে মারলে?

—হ্যাঁ

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি বললেন—তারপর? তাকে শকুনিতে খেলো?

—না। খবর পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম। পপি তখন মরে গেছে। তাকে নিয়ে এসে আমরা গঙ্গার ধারে মাটি চাপা দিলাম।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সুরেন পপিকে রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ?

সেখান থেকে পপি পালিয়ে এল?

—হ্যাঁ, সেইদিনই, ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে

তিনি উৎসুক হয়ে জিগেস করলেন—কি রকম?

আমি বললাম—ভোরবেলা মেজকাকা তাকে দড়ি দিয়ে গোরুর গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গেলেন। পপি কিছুতেই যাবে না—দড়ি টানাটানি করে, কেঁদে-কেটে, চেঁচামেচি করে নানাভাবে আপত্তি জানাতে লাগল। তবু তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হল—মেজকাকা বললেন, সেখানে একটা কুকুরের দরকার। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পপি আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় ছিল। ভাগলপুরের বাড়ীটা সে আগলাতো। তার ভরসায় বাড়ীর সদর দরজা খোলাই থাকত, সেটা লাগাবার কথা আমাদের মনেই পড়ত না। যেদিন ভোরে মেজকাকা তাকে নিয়ে গেলেন, সেইদিনই সন্ধ্যার পর আমরা সবাই খেতে বসেছি। পপি নেই, কারুরই ভাল লাগছে না। হঠাৎ ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে ঝড়ের মত পপি এসে উপস্থিত। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা, এখানে ওখানে অন্য কুকুরের কামড়। বাড়ী পৌঁছে আনন্দে সে পাগলের মত লাফালাফি চেঁচামেচি করতে লাগল। মা বললেন—ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে। আহা, সারাদিন হয়ত কিছু খেতে পায়নি। ওকে আগে খেতে দি। পরে শুনলাম—সত্যিই তাই। রামচন্দ্রপুরে পৌঁছে ওর বাঁধন খুলে দিতেই ও বাড়ী মুখো ছুটতে শুরু করে। এক চুমুক জল পর্যন্ত সেখানে খায়নি। ওঁরা অনেক ডাকাডাকি করেছেন—ও ফেরেনি। ষোলো মাইল পথ চিনে, অন্য কুকুরের কামড় খেয়ে ঠিক বাড়ী ফিরে এসেছে।

চোখের জল সামলে শরৎচন্দ্র বললেন—কত ভাল কুকুর ছিল পপি দেখছিস? তাকে গুলি করে মেরে ফেললে? মানুষ এমন পারে?

মন্দার হিল-এর ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল। গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ সে গাড়ীর সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় তাঁদের জিনিসপত্র তোলাচ্ছিলেন।

আমি শরৎচন্দ্রকে বললাম—আপনি সোজা রামচন্দ্রপুরে চলে যাচ্ছেন। আমাদের বাঙ্গালীটোলার বাড়ীতে ত আজকের দিনটা থাকতে পারতেন। আপনার অত প্রিয় গঙ্গা ত এখনো বাড়ীর পাশ দিয়েই বইছে।

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—নারে, বাড়ীতে গিয়ে পপিকে দেখতে পাব না, সে ভারি কষ্ট হবে।

সুরেন্দ্রনাথ এসে বললেন—চল শরৎ, গাড়ী এবার ছাড়বে।

* (১) গান্ধীজীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন তার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি ছিল—গুর্জর দেশ রতন প্রদীপ সারা দুনিয়ার আলো/মসী মাখা এই আঁধার আকাশে অমলিন দীপ জ্বালো।

* অবশেষে পুলিশ একথা জানতে পেরে একদিন আচমকা গৃহ-ভারতীতে হানা দেয়। রক্ষে যে তখন কোনো বিপ্লবী সেখানে লুকিয়ে ছিলেন না।

গার্ড সাহেব যাচ্ছিলেন তাঁর কামরার দিকে। শরৎচন্দ্র বললেন—মিস্টার গার্ড, আমি সেকেণ্ড ক্লাশ প্যাসেঞ্জার, টিকানি স্টেশনে নামব। সংগে জিনিসপত্র অনেক আছে—গাড়ী একটু বেশীক্ষণ থামিও।

গার্ড সাহেব সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। গাড়ীতে উঠে বসে শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন, তুই কবে আসছিস ?

—কাল

গাড়ী ছেড়ে দিল।

শরৎচন্দ্র যখন গৃহ-ভারতীতে গিয়েছিলেন, গৃহ-ভারতীর তখন সবেমাত্র শৈশবকাল চলেছে। সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনার প্রায় কিছুই তখনো রূপায়িত হয়নি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রামচন্দ্রপুর ও তার আশ-পাশে গ্রামের যে পরিবেশ ছিল, সেই পরিবেশে, অল্প সময়ের মধ্যে, সেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা খুবই কঠিন ছিল। অর্থ-বল থাকলে হয়ত কিছুটা অগ্রগতি করা সম্ভব হত ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের তা ছিল না। উপরন্তু, শিক্ষার ব্যাপারে সেখানকার গ্রাম্যমানুষ তখনো প্রায় উদাসীন মনোভাবাপন্ন ছিল। কাজেই সুরেন্দ্রনাথের গৃহ-ভারতীর অগ্রগতি মন্থর হওয়া অস্বাভাবিকও নয়, আশ্চর্যেরও নয়, সেখানকার অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী ও একান্তভাবে কৃষি নির্ভর এবং চরম দরিদ্র। চাষবাস ছাড়া জগতে যে আর কিছু করবার আছে বা থাকতে পারে, তা তাদের চিন্তায় আসত না। পুরুষ পরম্পরায় তারা চাষ-বাসের কাজই করে আসছিল। তাদের ধারণা ছিল, লেখাপড়ার ব্যাপারটা শহুরে বাবুদের জন্যে, তাদের জন্যে নয়। তাদের কাজ কেবল চাষ করা। ফসল ভাল হলে খাওয়া, না হলে পেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা। তাছাড়া ছিল তাদের নানা রকম কুসংস্কার। পাহাড়ের মত বিপুল পরিমাণ এই উদাসীনতা ও কুসংস্কারের মধ্যে দিয়ে পথ করে তাদের হৃদয়ে পৌঁছতে সময় লাগার কথা। সুরেন্দ্রনাথ সেই চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছিলেন। গুটিকয়েক ছেলে গৃহ-ভারতীতে পড়তে আসত। তাদের ভাষা ছিল গ্রাম্য হিন্দি ; সুতরাং সে ভাষায় তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র অবশ্য গৃহ-ভারতীর অগ্রগতি দেখতে সেখানে যাননি। তিনি কি জন্যে সেখানে গিয়েছিলেন সেকথা আগে বলেছি।

তিনি গৃহ-ভারতীতে যাবার পরদিন সকালে আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, হাতের শূন্য জল-পাত্রটা টুং টাং করে বাজাতে বাজাতে এবং গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে তিনি মাঠ থেকে ফিরছেন। সেখানে মাঠে প্রাতঃকৃত্য সারতে হত।

সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে রবি আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে বললাম—শরৎদা ত বেশ খুশী দেখছি, রবি ?

রবি বললে—হ্যাঁ, এখানে এসে ওঁর মন বেশ ভালই আছে। জায়গাটা ওঁর ভাল লেগেছে। কাল টিকানি স্টেশন থেকে ছ' মাইল পথ হেঁটেই এসেছেন, যদিও ওঁর জন্যে গোরুর গাড়ীর ব্যবস্থাও ছিল। উনি বললেন—গোরুর গাড়ী কি হবে ? এ-টুকু পথ আমি খুব হাটতে পারব। সত্যিই, স্বচ্ছন্দে হেঁটে এলেন। এখানে এসে সব ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন—বাঃ, বেশ খোলামেলা জায়গা ত! কুকুর পুষেছিস ? নইলে পাগলা শেয়ালে কামড়াবে যে।

আমি হেসে বললাম—প্রথমেই কুকুরের খোঁজ ?

রবি বললে—হ্যাঁ। চারটে কুকুর আছে শুনে খুব খুশী। কাল দু-বেলাই নিজের খাওয়ার পর তাদের ডেকে ডেকে খাওয়ালেন।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন।

আমাকে বললেন—এসেছিস্ ? কখন্ বেরিয়েছিলি ?

বললাম—আলো ফোটবার আগে

—হেঁটে এলি ?

—হ্যাঁ।

—গাড়ীতে এলি না কেন ?

—গাড়ী অনেক দেরীতে ছাড়ে, পৌঁছতে দেরী হয়ে যেত।

—যা, চা-টা খেগে যা।

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রবি বললে—শরৎদা কয়েতবেলতলায় বসে লিখবেন।

—কয়েতবেলতলায় কেন ?

—জায়গাটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে, বলেছেন—ঐখানেই ওঁর বসবার ব্যবস্থা করে দিতে।

বাড়ী থেকে শ'খানেক গজ দূরে কয়েকটা কয়েতবেল গাছে ঘেরা খানিকটা জায়গা ছিল। জায়গাটি নির্জন ও মনোরম। শরৎচন্দ্রের তাই ভাল লেগেছিল জায়গাটি।

আমি বললাম—ওঁর ত মুহুর্মুহু চা আর তামাক চাই। তার কি ব্যবস্থা হবে ? ও'র ভোলা চাকর ত আসে নি এবার।

রবি বললে—গোরাকে (রবির পরের ভাই) উনি তামাক সাজতে শিখিয়ে দিয়েছেন। গোরা তামাক সাজবে। আমরা বাড়ী থেকে চা নিয়ে যাব।

যতদূর মনে পড়ে শরৎচন্দ্র সে সময়ে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব লিখছিলেন। মনে হয় তাঁর কমললতার জন্ম গৃহ-ভারতীর সেই নির্জন ও মনোরম কয়েত-বেলতলায়। তিনি সেখানে থাকতে আমি আরো কয়েকবার গৃহ-ভারতীতে গিয়ে দেখেছি, সেই কয়েকবেলতলায় মাদুর পেতে বসে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে তিনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন।

শরৎচন্দ্র গৃহ-ভারতীতে মাসখানেকের ওপর ছিলেন। বিপ্লবীদের আনাগোনা তখনো সেখানে শুরু হয়নি। স্থানীয় গ্রাম্য লোকদের আসা-যাওয়া অবশ্য লেগেই থাকত, কিন্তু সেটা সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্রের আকর্ষণে নয়, বাঙালীবাবুদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে তাদের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। শরৎচন্দ্র কে এবং কি' তাঁর মূল্য, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাদের ছিল না, থাকবার কথাও নয়। বাইরে থেকে যাবার মধ্যে আমি যেতাম আর যেতেন আমাদের একজন ভগিনী-পতি প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি সে সময়ে সাবোরে ছিলেন। সাবোর রামচন্দ্রপুরের মাইল সাতেক উত্তরে অবস্থিত। পরিষ্কার দিনে গৃহ-ভারতী থেকে সাবোর কলেজের গম্বুজ দেখা যেত। প্রফুল্লকুমার শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শরৎচন্দ্রও তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। 'ভুলের বোঝা' নামে প্রফুল্লকুমারের একখানি ছোট গল্পের বই শরৎ-চন্দ্রের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বছর তিন-চার আগে শরৎচন্দ্র একবার ভাগলপুরে এলে প্রফুল্লকুমার তাঁকে আমন্ত্রণ করে সাবোরে নিয়ে যান এবং সেখানে এক সভায় সেখানকার বিশিষ্ট বাঙালীরা শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এবারেও প্রফুল্লকুমারের ইচ্ছে গৃহ-ভারতী থেকে শরৎচন্দ্রকে একদিন তিনি সাবোরে নিয়ে যাবেন। সে ইচ্ছে প্রকাশ করে একদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—এত কাছে যখন এসেছেন শরৎদা তখন একদিন আপনাকে সাবোরে যেতে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন, সাবোরে ত আমি একবার গিয়েছিলাম। তুমিই ত আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে।

প্রফুল্লকুমার বললেন—সে ত বছর তিন-চার হয়ে গেল। আপনি এখানে এসেছেন শুনে সবাই আমাকে ধরেছে আপনাকে আর একবার নিয়ে যাবার জন্যে। আপনি রাজী হলে আমি সব ব্যবস্থা করি।

খানিকক্ষণ তামাক টানার পর শরৎচন্দ্র বললেন—আমাকে এবার বাড়ী ফিরতে হবে প্রফুল্ল। সাবোরে যাওয়া এবারে আর হবে না। আবার যদি আসি ত দেখা যাবে।

প্রফুল্লকুমার তবু চেষ্টা ছাড়লেন না, বল-লেন—সাবোর হয়েও ত আপনি হাওড়ায় ফিরতে পারেন। এখান থেকে সাবোরে গিয়ে একদিন সেখানে থেকে পরের দিন হাওড়ায় চলে যাবেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে খুব সুবিধের হবে না প্রফুল্ল। সাবোরে ট্রেন খুব কম সময় দাঁড়ায়, ভাগলপুরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। ভাগলপুর হয়ে যাওয়াই সুবিধের হবে ; সংগে অনেক জিনিসপত্তর আছে কিনা!

প্রফুল্লকুমার শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন—সাবোরে ট্রেন যাতে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় সে ব্যবস্থা আমি করব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—না প্রফুল্ল, সাবোর এবার থাক। আমি এখান থেকেই ফিরে যাব।

শরৎচন্দ্রের জীবনযাত্রা খুবই অনাড়ম্বর ও সাদা-সিদে ধরনের ছিল। তাই অতি সহজেই তিনি গৃহ-ভারতীর জীবনযাত্রার সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। মাছ মাংস ডিম সেখানে পাওয়া যেত না, নিরামিষ খেতে হত। টাটকা শাকসবজি ফলমূলও সেখানে নিত্য পাওয়া যেত না, হাটের দিন দূরের কোনো গ্রাম থেকে বা ভাগলপুর শহর থেকে আনাতে হত। কিন্তু এ সব অসুবিধে তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। অবশ্য দুধ, দই, ঘি-এর সেখানে প্রাচুর্য ছিল। তাঁর নেশার জিনিসগুলি অর্থাৎ চা, তামাক আর আফিম ঠিকমত পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। এগুলি আনতে হত ভাগলপুর থেকে।

সকালে বেলা করে ওঠা তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। গৃহ-ভারতীতেও তাঁর সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হত না, যদিও সেখানে গাছ-পালা বাড়ীঘর না থাকায় সূর্য ওঠার প্রায় সংগে সংগেই চড়চড়ে রোদ উঠে যেত। শয্যাত্যাগ করার পর চা-তামাক খেয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এবং সামান্য জলযোগ করে তিনি সাধারণত চলে যেতেন কয়েতবেলতলায়। সেখানে বসে লিখতেন প্রায় একটা-দেড়টা অবধি। দুপুরে স্নানাহারের পর ঘুমের অভ্যাস তাঁর কোনোদিনই ছিল না। সে সময়টা সাধারণত তিনি ঘরে বসে বই পড়তেন। বিকেলে চা-এর পর একটু বেড়াতেন। সন্ধ্যায় পর চলত আলোচনা বা গল্প। গল্প বলতেন তিনি নানা রকমের—বেশীর ভাগই তাঁদের ছেলেবেলার ও রাজুর গল্প। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অনিয়মের রাজা। নিয়ম মেনে চলা তাঁর ধাতে সইত না। সেটা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। নিয়ম ভাঙ্গাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সুতরাং তাঁর গৃহ-ভারতীর দিনগুলি যে ঠিক এক নিয়মেই কাটত তা নয়। কোনোদিন হয়ত তিনি কয়েতবেলতলায় যেতেনই না, লিখতেনও না সারাদিন, কিছু গল্প করেই কাটিয়ে দিতেন সমস্তদিনটা। আবার কোনোদিন হয়ত সকাল থেকে বাগান নিয়েই মেতে থাকতেন, লেখাপড়বার কথা মনেই পড়ত না। এক-একদিন তাঁর খেয়াল যেত গানবাজনার দিকে। সেদিন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে বসতেন, তাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শেখাতেন।

অবশেষে তাঁর গৃহ-ভারতী ছেড়ে চলে যাবার দিন এল। চোখের জলে আমরা তাঁকে বিদায় জানালাম। কুকুরগুলো অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর সংগে সংগে গেল।

ভাগলপুরের বাড়ীতে সেবারে তাঁর যাওয়া হয়নি। তার বেশ কয়েক বছর পরে, ১৯৩৭ সালে তিনি দেওঘর থেকে শেষবারের মত ভাগলপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

গৃহ-ভারতী আজ আর নেই। গৃহ-ভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও শেষ পর্যন্ত সফলতার পথে আর এগোয়নি। এক রাত্তিরে সেখানে এক ভয়াবহ ডাকাতি হওয়ার পর পুলিসের পরামর্শে সুরেন্দ্র-নাথকে ভাগলপুরে ফিরে যেতে হয়।

গৃহ-ভারতী নেই, কিন্তু সেখানকার মাটি আর সেই কয়েতবেলতলা শরৎচন্দ্রের পদস্পর্শ ও স্মৃতি নিয়ে অমর হয়ে আছে।